উদাসীন পথিকের মনের কথা-মীর মশাররফ হোসেন

এম এ, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সেম--প্রথমপত্র--গদ্য ও প্রবন্ধ পাঠ

২

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরম্পরা ও মীর মশাররফ হোসেন

১। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ প্রথমাবধি তাদের প্রতিবেশি সমাজের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে পথ হেঁটেছিল, স্থানে স্থানে অগ্রসর অবস্থানে ছিল--আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্য যেখানে নতুন করে সেজে উঠেছে সেখানে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব সামান্য। মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্র-র সাহিত্যিকের পাশে একমাত্র উচ্চারিত নাম মীর মশাররফ হোসেন। উল্লেখ্য, পলাশির যুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত মুসলমান সমাজকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে সপ্রতিভ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল।

২। উনিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এমনিতে জাতিগতভাবে মুসলমান সমাজের অবস্থান স্বতঃস্ফূর্ত না হলেও ব্যক্তিগতভাবে মশাররফ তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের সাপেক্ষে কোনো অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁর কোনো কোনো সৃষ্টি বিশেষত বিষাদসিন্ধু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্যাবধি অনন্য সংযোজন।

৩। সাহিত্যিক মশাররফের মন ও মননের চলমানতা একমুখিন ছিল না। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শৈল্পিক সৌন্দর্য সৃষ্টি দুই এর মধ্যে সামঞ্জস্য করার ঐকান্তিক চেষ্টা তাঁর মধ্যে সুস্পষ্ট। তবে এই চেষ্টা সবসময় সফল হয়নি। এতে তাঁর কোনো কোনো রচনা রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

মীর মশাররফ হোসেন ও তাঁর উদাসীন পথিকের মনের কথা

১। বিষাদসিন্ধু ব্যতীত মশাররফের আর যেসব সৃষ্টি তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে উদাসীন পথিকের মনের কথা, জমিদার দর্পণ, আমার জীবন, গাজী মিয়াঁর বস্তানী প্রভৃতি। জমিদার দর্পণ বাংলা দর্পণ নাটকের ধারায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ-এর পরেই এর অবস্থান। আমার জীবন বাংলা আত্মজীবনীর ধারায় স্মরণীয় সংযোজন। সামাজিক নক্সা হিসেবে গাজীমিয়াঁর বস্তানীর নিজস্বতা রয়েছে।

২। পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য আরও সব রচনা থাকলেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস স্রষ্টা মশাররফের সৃষ্টিধারায় দ্বিতীয় অবস্থানে থাকার যোগ্য উদাসীন পথিকের মনের কথা। সৃষ্টি হিসাবে উদাসীন পথিকের মনের কথা-র বিশেষত্ব এর রচনারীতি। উপন্যাস, গদ্য আখ্যান প্রভৃতি প্রচলিত কোনো ছঁকে একে ফেলা যায় না। এ এক অন্য ধরনের রচনা; একান্তভাবে নিজস্বতায় ভাস্বর।

উদাসীন পথিকের মনের কথা-র কথা

১। প্রকাশকাল--১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ

২। বিষয়বস্তু--স্রষ্টার পারিবারিক বৃত্তান্ত, দেশ কালের কথা প্রভৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বাস্তব সত্যের নিবিড় ছায়াপাত আছে, তবে বাস্তবতা এখানে শেষ কথা নয়--বাস্তবসত্যকে শিল্পের রঙে রঞ্জিত করে পরিবেশন করা হয়েছে।

৩। দেশ-কালের কথা হিসাবে প্রধান্য পেয়েছে নীলচাষ, নীলকরদের অত্যাচার, নীল আন্দোলন, পাবনার কৃষক বিদ্রোহ ইত্যাদি।

৪। কাহিনি-সূত্র

ক) নীলকর কেনীর অত্যাচার--জমিদার প্যারিসুন্দরীর সঙ্গে কেনীর বিরোধ--কেনী কর্তৃক প্যারিসুন্দরীর প্রজাদের জমিতে জোর করে নীল রোপণ, অসহায় প্রজাদের বাড়ি লুণ্ঠন--প্যারিসুন্দরীর পক্ষ থেকে কেনীর কুঠি আক্রমণ, পরিণামে মামলা, মকদ্দমা--উভয়পক্ষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

খ) মীর মশাররফ হোসেন এর পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেনের জমিদারি বৈভব--জামাতা সা গোলাম কর্তৃক প্রবঞ্চিত হওয়া--বিবাব সূত্রে নতুন করে প্রতিষ্ঠা লাভ--কেনীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক--বাইজী প্রীতি, সেইসূত্রে পারিবারিক বিপর্যয়--পারিবারিক বিপর্যর্য়ের প্রভাব পড়েছে স্রষ্টা মশাররফের উপর।

গ) ইংরেজ রাজজুত্রের আগমন, তৎসূত্রে প্রবল নীল আন্দোলন--কেনীর বিপর্যয়ের সূচনা ও পরিণামে কেনীর সর্বশান্ত হওয়া এবং মৃত্যু।

দেশ-কালের কথা ও উদাসীন পথিকের মনের কথা

১। পলাশির যুদ্ধে (১৭৫৭)-র সূত্রে বাঙালি ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ব্যাপক রদবদল--বিদেশি শাসনের প্রবর্তন--বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রবল অভিঘাত। উল্লেখ্য, মুসলমান রাজাদের শাসন কোনোভাবেই বিদেশীয় শাসন ছিল না। মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে সিরাজদ্দৌলা এরা সকলেই ছিলেন এ দেশের ভূমিপুত্র।

২। পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে দেশের অর্থনীতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটলো। এতকাল বাণিজ্যিক ফসলের ধারণা সেভাবে কার্যকর ছিল না। লোকে প্রয়োজন মতো ধান গম, সবজি এসব চাষ করতো। এখন বাণিজ্যিক ফসল হিসাবে নীল খুবই প্রাধান্য পেলো। নীলের কারবার অত্যন্ত লাভজনক বিষয়। অসংখ্য ইংরেজ তাই নীলচাষের দিকে নজর দিল। আরও মুনাফার জন্য জোর করে ধানের জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য করা হলো-পরিণতিতে ঘটলো নীল বিদ্রোহ।

৩। ইংরেজ রাজের সঙ্গে দেশীয় লোকেদের সম্পর্কের ঘাত প্রতিঘাত নানা মাত্রা নিল। একটা সময় পর্যন্ত হিন্দু সমাজ ইংরেজ রাজের প্রতি গভীর আনুগত্য প্রকাশ করেছিল; তখন মুসলমান সমাজ তাদের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। উত্তর মহাবিদ্রোহ পর্বে অবস্থার পরিবর্তন হয়। মুসলমান সমাজ অনুভব করে তাদের ইংরেজ বিরোধিতার ফল ভালো হচ্ছে না। ইংরেজদের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রেখে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ উন্নতির পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তুলনায় তারা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। কাজেই তারা এখন ইংরেজ বিরোধিতার জায়গা থেকে সরে এসে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরিতে উদ্যোগী হয়।

৪। মুসলমান সমাজ শাসক শক্তির উদ্দ্যেশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে শাসক ইংরেজ তা লুফে নেয়। ততদিনে হিন্দু মানসে ইংরেজ সম্পর্কে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। এই ক্ষোভকে প্রশমিত করার অস্ত্র হিসাবে মুসলমান সমাজকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে ইংরেজ প্রভুরা। সরকারি সুয়োগ সুবিধার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় মুসলমান সমাজ। এতে হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ তৈরি হয়। মুসলমান সমাজের সঙ্গে তাদের মানসিক দূরত্ব বেড়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই দূরত্ব পরবর্তীতে উনিশশো পাঁচ এর বঙ্গভঙ্গ ও সাতচল্লিশের দেশভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

৫। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে দেশীয় অর্থ ব্যবস্থায় এক মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এতদিন কৃষকরাই ছিল জমির মালিক, জমিদাররা খাজনা সংগ্রাহকের ভূমিকা পালন করতো মাত্র। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে জমিদার হয়ে উঠেছিল জমির মালিক। এতে জমিদার শ্রেণির ইংরেজদের প্রতি আনুগত্যের শেষ ছিল না। এই আনুগত্যের প্রেক্ষিতে তারা ইংরেজ প্রভুদের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে এবং সেইসূত্রে নিজস্ব জমিদারিতে সর্বময় কর্তায় পরিণত হয় তারা। প্রজাদের উপর তাদের দৌরাত্বের শেষ থাকে না। এখানেই শেষ নয়। প্রাক্ ইংরেজ পর্বে এদেশে সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ছিল শেষ কথা। ইংরেজ রাজ প্রবর্তন করলো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।

৬। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অভিঘাতে এদেশের অর্থনৈতিক জীবনচিত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটলো। ব্যবসা বাণিজ্য করে একটা শ্রেণি রাতারাতি লাল হয়ে গেল। এদিকে ইংরেজ রাজ তাদের ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য দেশীয় কুঠির শিল্প সমূহকে ধবংসের শেষ সীমায় এনে দাঁড় করালো।

৭। ইংরেজ আমলে, বিশেষত উনিশ শতকে বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ছিল না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণ সুবিচার পেত না। আসামী পক্ষ ইংরেজ জাতির লোক হলে তো কথাই ছিল না। নীলকরদের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি করে সত্য ছিল। জেলা শহরে বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে যারা অধিষ্ঠিত থাকতো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে স্থানীয় নীলকরদের সদ্ভাব তৈরি হতো। ফলত সুবিচারের পথে কাঁটা পড়তো।

৮। বিশ শতকে বাঙালির, সেইসঙ্গে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ ও ইংরেজ বিরোধিতার সুর যেভাবে উচ্চকিত হয়েছিল উনিশ শতকে কিন্তু তা হয়নি। তখনো পর্যন্ত বিরাট সংখ্যক মানুষ শাসক ইংরেজের প্রতি আন্তরিক দুর্বলতা পোষণ করতো। এদিকে ইংরেজদের দেখেই তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধেছিল; মাতৃভূমিকে অন্যরকম করে ভালোবাসতে শুরু করেছিল তারা; এতে বেশ একটা আত্মিক সংকট তৈরি হয়েছিল। একদিকে মাতৃভূমির প্রতি প্রেম, অন্যদিকে ইংরেজ প্রীতি; দুই এর মধ্যে সামঞ্জস্য রচনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন অনেকেই।

উদাসীন পথিকের মনের কথা অন্তরঙ্গ অন্বেষণ

১। উদাসীন পথিকের মনের কথা প্রচলিত ধারার রচনা নয়। উপন্যাস সুলভ প্লটের সংহতি, কাহিনির ধারাবাহিকতা বা চরিত্রের অন্তরঙ্গ উন্মোচন এখানে নেই। এটা ঠিক গল্পধর্মী রচনাও নয়। এখানে সেই অর্থে কোনো গল্প নেই। কাব্য বা নাটকের সঙ্গে এর কোনো তুলনা চলে না। আবার একে নিছক গদ্য আখ্যান বলাও সমীচীন নয়। এ এমন একটা রচনা যার সঙ্গে আর কিছুর তুলনা চলে না। শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রে নয়, সৃষ্টির অন্যান্য অঙ্গনেও মাঝে মধ্যে এমন দুই একটি রচনার সাক্ষাৎ মেলে যা রচনারীতির দিক থেকে স্পূর্ণ মৌলিক। উদাসীন

পথিকের মনের কথা-ও তেমনি মৌলিক সৃষ্টি।

২। উদাসীন পথিকের মনের কথা-র যে সব বৈশিষ্ট্যে আমরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই তার একটি হল সমকালীন সমাজ-ইতিহাসের উজ্জ্বল প্রতিবিম্বন। নীল আন্দোলন ও নীলবিদ্রোহ নিয়ে অনেক লেখালিখি হয়েছে, তারপরেও নীল আন্দোলনের ইতিবৃত্ত হিসাবে উদাসীন পথিকের মনের কথা-র গুরুত্ব অম্লান রয়েছে। এখানে নীল আন্দোলন সংশ্লিষ্ট এমন তথ্য প্রায় নেই যা প্রামাণ্য নয়।

৩। নীল আন্দোলনের পাশাপাশি সেদিনের জমিদারতন্ত্র, জমিদারদের পারস্পরিক সমঝোতা-সংঘাত, গ্রাম্য জীবনের আলো-অন্ধকারের দিক প্রভৃতির বিশ্বস্ত রূপায়ণ রয়েছে এখানে।

৪। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অভিজাত মুসলমান পরিবারের অন্তরঙ্গ জীবনের যে উপস্থাপন এখানে রয়েছে সেদিনের বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই বললেই চলে।

৫। একধারে ইংরেজ প্রীতি ও ইংরেজ বিরোধিতার যে দ্বন্দ্বে সেদিনের বুদ্ধিজীবী বাঙালি সমাজ বিক্ষত হয়েছিল তার উজ্জ্বল প্রতিবিম্বন রয়েছে এখানে।

৬। উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদ, মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালোবসা এসব দিকেরও অনন্য উপস্থাপন রয়েছে উদাসীন পথিকের মনের কথা-য়।

৭। প্যারিসুন্দরীর কর্তৃক কেনীর নীলকুঠি আক্রমণ, লাঠিয়ালদের যুদ্ধ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে বাঙালি জাতীয় ইতিহাসের এক ধূসর অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৮। গ্রন্থটির ভূমিকা অংশে স্রষ্টা মশাররফের যে বিবৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে আত্মজৈবনিক রচনার ইঙ্গিত মেলে। তবে উদাসীন পথিকের মনের কথা আত্মজৈবনিক রচনা নয়।

৯। উদাসীন পথিকের মনের কথা-র স্থানে স্থানে স্রষ্টা মশাররফের দার্শনিক মন ও মননের উচ্চকৃত উচ্চারণ রয়েছে।

উদাসীন পথিকের মনের কথা শৈল্পিক পর্যালোচনা

১। প্লটকে দুটি ধারায় বিন্যস্ত করে দেখা চলে। নীল চাষ, নীল আন্দোলন ও তার পরিণতির দিক এবং স্রষ্টা মশারফের পারিবারিক ইতিবৃত্ত।

২। কাহিনি গ্রন্থন, চরিত্র চিত্রণ এসব দিক থেকে উদাসীন পথিকের মনের কথা-র তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই. কোনো চরিত্র ই আলাদা করে পাঠককে প্রাণিত করে না। তবে সীমাবদ্ধ পরিসরে নীলকর কেনী, জমিদার সাগোলামের মধ্যে কিছুটা নিজস্বতা দেখা গেছে।

৩। ভাষারীতির র সাপেক্ষে গ্রন্থটির শিল্পমূল্য অসামান্য। বাংলা গদ্যভাষার নির্মাণে মশাররফের অনন্যতা বিষাদসিন্ধু-তে প্রতিপন্ন হয়েছিল। তারই সার্থক অনুবর্তন ঘটেছে এখানে।

৪। প্লটের সংহতি নেই, গল্পরস নেই, নেই চরিত্র চিত্রণে বৈভব, আছে সমকালীন সমাজ-ইতিহাসের বিশ্বস্ত রূপায়ণ। এমন অবস্থায় উদাসীন পথিকের মনের কথা-কে নক্সাধর্মী রচনা বলে মনে হতে পারে। বিশেষত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যেখানে বাংলা সাহিত্যে নক্সাধর্মী রচনার যথেষ্ট প্রচলন হয়েছিল। আলালের ঘরের

দুলাল, হুতোম প্যাঁচার নক্সার পাশাপাশি মশাররফ নিজেই রচনা করেছিলেন গাজী মিঁয়ার বস্তানী। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে একে নক্সাধর্মী রচনা বলা চলে না। তুলনামূলকভাবে কথাসাহিত্যের সঙ্গে এর অধিকতর অন্তরঙ্গতা অনুভূত হয়।

৫। উদাসীন পথিকের মনের কথা-র ভূমিকায় স্রষ্টা হিসাবে মশাররফ তাঁর নৈর্ব্যক্তিক অবস্থানের কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন। বাস্তবেও তাঁর সে অবস্থান প্রত্যক্ষ করি আমরা। নিজের পিতার চরিত্র বর্ণনায় তাঁর কলমের যে শাণিত উদ্ভাসন রয়েছে তা এককথায় অনবদ্য। নীলকর কেনীর প্রতি স্রষ্টার যে মানসিক অবস্থান তাতে যুগজীবনের অভিঘাত সুস্পষ্ট। তবে স্থানে স্থানে, বিশেষত সাগোলাম এর কথা বলতে গিয়ে স্রষ্টা কখনো কখনো তাঁর নৈর্ব্যক্তিক অবস্থানে স্থিত থাকতে পারেননি বলে মনে হয়।

সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর সংকেত

১। শ্রেণি বিচার

ক) প্রথাবদ্ধ ধারার রচনা নয়--উপন্যাস, গদ্য আখ্যান, নক্সাধর্মী রচনা কোনো কিছুর সঙ্গেই একে ঠিক মেলানো যায় না। তবে তুলনামূলকভাবে উপন্যাসের সঙ্গেই এর নিকট আত্মীয়তা বলে মনে হয়।

খ) প্রচলিত উপন্যাসে থাকে প্লটের সংহতি, চরিত্রের উজ্জ্বল চিত্রণ--যা এখানে নেই। তবে উপন্যাসের অন্য কিছু বৈশিষ্ট্যে ঋদ্ধ এ রচনা। যেমন--গদ্যভাষা, সমাজ বাস্তবতা, গভীর জীবনদর্শন, রসসৃষ্টি।

গ) যে ভাষায় উদাসীন পথিকের মনের কথা-র জাল বয়ন করা হয়েছে তা উপন্যাস সুলভ তো বটেই বরং তার থেকে অনেক বেশি কিছু। এ ভাষা শৈল্পিক রসে আদ্যন্ত সিক্ত। গদ্য আখ্যান বা নক্সাধর্মী রচনায় যা সচরাচর দেখা যায় না।

ঘ) প্লট প্রচলিত ধারার উপন্যাস সুলভ নয় এটা ঠিকই, তবে এও ঠিক যে, উপন্যাসের প্লট সুনির্দিষ্ট নয়। উপন্যাসের প্লট বিচিত্র রকমের হয়ে থাকে। কাহিনি মুখ্য, কাহিনি সাপেক্ষ, সুনির্দিষ্ট কাহিনি নিরপেক্ষ ইত্যাদি নানা রকমের প্লট নির্ভর রচনা উপন্যাস হিসাবে বিবেচিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে। সেদিক থেকে বিচার করলে উদাসীন পথিকের মনের কথা-র প্লটকেও উপন্যাস সুলভ বলা যায়।

ঙ) ব্যক্তি চরিত্রের প্রাধান্য নেই, তবে উদাসীন পথিকের মনের কথা চরিত্র নিরপেক্ষ কোনো সৃষ্টি নয়। কোনো কোনো চরিত্র নিজস্ব জীবন-বৈশিষ্ট্যে রীতিমতো ভাস্বর। যেমন নীলকর কেনী, জমিদার প্যারিসুন্দরী ও স্বার্থান্ধ সাগোলাম। নীলকর হিসাবে কেনীর যে উপস্থাপন তা আলাদা করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে--ভয়াল ভীষণ এক সত্যের নাম মিঃ কেনী। তার হিংস্রতা, শেষ এই। লেখক সেই কেনীকেই আবার অন্য রঙে রঞ্জিত করেছেন। জোকীর স্ত্রী ময়নার প্রেমিক পুরুষ সে। প্রেমিক পুরুষ হিসাবে কেনী আদর্শ স্থানীয়। তার প্রেম দেহ নিরপেক্ষ নয় অবশ্যই। আবার দেহসর্বস্বও নয়। তাই গর্ভবতী ময়নার মৃত্যুতে রীতিমতো বিচলিত হয়েছে সে। সীমাবদ্ধ পরিসরে ময়না চরিত্র সেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাও আকর্ষণীয়।

চ) সমাজবাস্তবতার রূপায়ণ উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই দিকের বিচারে উদাসীন পথিকের মনের কথা যে কোনো শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সঙ্গে তুলনার যোগ্য। উনিশ শতকের বাংলাদেশ ও বাঙালির জীবন-বাস্তবত

এবং জীবনবোধের যে উপস্থাপন এখানে রয়েছে তা অনবদ্য। (পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্রে বিস্তৃত করতে হবে)

ছ) উপন্যাস সুলভ জীবনদর্শনে ঋদ্ধ উদাসীন পথিকের মনের কথা। স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবনবোধ, সেইসঙ্গে ঔপনিবেশিকতার ঘোলা জলে ডুবসাঁতার কাটা একটা জাতির জীবনভাবনা--দুই এর সমন্বয়ে উদাসীন পথিকের মনের কথা-র ঘটনা ও চরিত্র যে নির্মিতি পেয়েছে তাকে উপন্যাস সুলভ বললে খুব ভুল বলা হয় না।

জ) সমাজ ইতিহাসের বিশ্বস্ত রূপায়ণ রয়েছে উদাসীন পথিকের মনের কথা-য়। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, সমাজ-ইতিহাসের কথা তুলে ধরার জন্য গ্রন্থটির পরিরকল্পনা করেছিলেন স্রষ্টা মশাররফ। সাহিত্য সৃষ্টির ঐকান্তিক তাগিদ থেকেই উদাসীন পথিকের মনের কথা-র অঙ্গনে পা রেখেছিলেন তিনি । ব্যক্তি মশাররফের জীবনের পরিসর বিশেষ বিস্তৃত নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতার বহর অতি দীর্ঘ। ব্যাপ্ত এই জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের আধারে পরিবেশন করা ছিল এক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। এ কাজ করতে গিয়ে দার্শনিক সুলভ নৈর্ব্যক্তিতাকে পাথেয় করার চেষ্টা করেছিলেন। এতে তিনি সম্পূর্ণ সফল হননি হয়তো, কিন্তু তাঁর ঐকান্তিকতার দিকটি প্রশ্নাতীত। আর এখানেই উদাসীন পথিকের মনের কথা-র রূপকার অন্যান্য গদ্য আখ্যানকার বা নক্সাধর্মী স্রষ্টাদের থেকে আলাদা--তুলনায় কথাকার সমাজের সঙ্গে আত্মীয়তা--উদাসীন পথিকের মনের কথা-র উপন্যাস হয়ে ওঠা।

ঝ) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উদাসীন পথিকের মনের কথা-র স্থানে স্থানে মশাররফের ব্যক্তিজীবনের ঘনিষ্ঠ ছায়াপাত আছে, বিশেষত তার পারিবারিক ইতিবৃত্তের। তাই গ্রন্থটিকে আত্মজৈবনিক রচনা হিসাবে অভিহিত করার কিছুটা অবকাশ থেকে যায়। তবে আমাদের মতে, উদাসীন পথিকের মনের কথা আত্মজৈবনিক রচনা নয়। প্রথমত ব্যক্তি জীবনের উপাদান এখানে তুলনায় কম--এক হিসাবে ব্যক্তিজীবনের কথা প্রায় নেই, যেটুকু আছে তা পারিবারিক বৃত্তান্ত। দ্বিতীয়ত, পারিবারিক ইতিবৃত্ত বর্ণনা করার জন্য এই গ্রন্থ রচনা করা হয়নি। জীবন অভিজ্ঞতা ও জীবন সম্পর্কিত ব্যক্তিগত বীক্ষার ভাষ্যরচনা উদাসীন পথিকের মনের কথা-র মূল লক্ষ্য।

২। ঔপনিবেশিক জীবনবোধ ও জীবনচিত্রের প্রামাণ্য দলিল

ক) ঔপনিবেশিকতা, ঔপনিবেশিক জীবনবোধ এসব ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবোত্তর ধারণা। একদিকে শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ, অন্যদিকে শিল্পজাত দ্রব্য বাজারজাত করা--এই দ্বিবিধ লক্ষ্যে স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে নতুন নতুন ভূখণ্ডে পা রাখা, সেখানে আধিপত্য বিস্তার করেছিল ইউরোপীয় শিল্প-পুরুষরা। এই আধিপত্য বিস্তারের নাম ঔপনিবেশিকতা। ঔপনিবেশিকতার স্বীকার হয়েছে যে জাতি তাদের মানসিকতার অন্যনাম ঔপনিবেশিক জীবনবোধ।

খ) ঔপনিবেশিক জীবনবোধের একটা দিক বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শিল্পবিপ্লব ও তৎপ্রসূত ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে এমন এক আকর্ষণ থাকে যাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না; আবার একে গ্রহণ করাও সহজ হয় না। এতে বেশ এক মানসিক সংকট তৈরি হয়। নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি একাধারে আকর্ষণ ও বীতরাগ--দুই এর টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত হয়ে একসময়ে মরিয়া হয়ে নতুন জীবন সংস্কৃতির গভীরে ঝাঁপ দেওয়া--হয়তো বা আত্মাহূতি।

গ) ঔপনিবেশিক জীবনবোধ ও জীবনচিত্রের ঘনিষ্ঠ রূপায়ণ রয়েছে উদাসীন পথিকের মনের কথা-য়। যথা--

গ-১। বিজাতীয় জাতি ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ। স্রষ্টা মশাররফ, তাঁর পিতা মোয়াজ্জেম হোসেন থেকে শুরু করে প্যারিসুন্দরীর লাঠিয়াল পর্যন্ত কেউই এর ব্যতিক্রম নয়। (প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করতে হবে)

গ-২। বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ থাকে, আবার বীতরাগও তৈরি হয় সেখান থেকেই। প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্বে জাতীয়তাবাদের ধারণা সুদৃঢ় ছিল না। ঔপনিবেশিতকাই জাতীয়তাবাদকে বিশেষ করে লালন করে। ঔপনিবেশিতাকে স্বীকার করে নিতে হলে জাতীয়তাবাদকেও স্বীকার করে নিতে হয়। আর তখনই দেখা দেয় বিরোধ। বিদেশি রাজশক্তির হাতে মাতৃভূমি ও তার সন্তানদের জন্য লাঞ্ছনা কিছুতেই মেনে নেওয়া চলে না। ক্ষোভ দানা বাঁধে। একসময় তা বিদ্রোহের রূপ নেয়। উদাসীন পথিকের মনের কথা-য় এই সম্পূর্ণ অবস্থার চিত্রণ নেই, তবে অনেকটা আছে।--নীলকর কেনীর পরাজয় শুধুই ঐতিহাসিক বাস্তব নয়, এর মধ্যে ঔপন্যাসিকের মন ও মননের প্রতিবিম্বনও সুস্পষ্ট। বিশেষত কেনীর কুঠির শেষ স্মৃতিচিহ্ন ভাঙা ইটগুলো পর্যন্ত নদীর জলে ভেসে যাওয়া--ইংরেজের তৈরি বাঁধ ভেসে গেছে বাংলাদেশের এক নদীর জলাঘাতে--এখানে ঘটনা বর্ণনায় এমন এক ছন্দ আছে যা মোটেই নৈর্ব্যক্তিক নয়--প্যারিসুন্দরীর বীরত্বের মধ্যে অন্য একটা আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করেছেন স্রষ্টা মশাররফ--প্যারিসুন্দরীর লেঠেলরা যে ভাবে কেনীর বউ এর কথায় গলে গেছে, তার ভিক্ষার ধন দু-হাতে কুড়িয়ে নিয়েছে তা ঔপনিবেশিক মানসিকতার আর এক দিক।

গ-৩। কেনীর মিসেসের ইংল্যান্ডে গমনের প্রেক্ষিতে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবসার যে উচ্চকিত উচ্চারণ রয়েছে তাও ঔপনিবেশিক জীবনবোধের অনন্য প্রকাশ।

গ-৪। সা গোলাম প্রভৃতির নেতৃত্বে দেশীয় জনগণ সেভাবে বিদেশী অত্যচারির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তা ঔপনিবেশিক মানসিকতার ফসল।

ঘ) উদাসীন পথিকের মনের কথা-য় ঔপনিবেশিক মন ও মননের প্রকাশ চূড়ান্ত নয়। এখানে বিদেশি জাতি-সংস্কৃতির প্রতি একাধারে অনুরাগ বীতরাগকে লালন করা হয়েছে। দুই এর সংমিশ্রণে তৃতীয় কোনো অবস্থানে উপনীত হওয়ার বার্তা নেই। এদিকে আজ আমরা সেই তৃতীয় অবস্থানে অধিষ্ঠিত রয়েছি বা অধিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করছি। আজ বিশ্বায়নের যুগে বাঙালি তথা ভারতীয়দের একটা অংশ ভারতীয় ও ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে আর আলাদা কিছু বলেভাবতে চাইছে না। এক্ষেত্রে যারা এখনও একটু অন্যরকম করে ভাববার কথা ভাবছেন তারাও শেষ পর্যন্ত তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারবে না। অর্থাৎ উদাসীন পথিকের মনের কথা-য় প্রতিবিম্বিত ঔপনিবেশিকতার সীমানা ডিঙিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছি আমরা।

ঙ) প্রসঙ্গত ঔপনিবেশিক জীবনবোধ ও জীবনচিত্রের রূপায়ণে উদাসীন পথিকের মনের কথা-র এই যে অসম্পূর্ণতা তা অবশ্যই গ্রন্থটির বা এর স্রষ্টার ব্যক্তিগত কোনো সীমাবদ্ধতা নয়। এ সীমাবদ্ধতা সময়ের। এখন থেকে একশত বছররেও আগে প্রকাশিত হয়েছিল উদাসীন পথিকের মনের কথা। তখন ঔপনিবেশিক জীবনবোধের যে স্বরূপ তার নিরিখে দেখলে উদাসীন পথিকের মনের কথা-য় ঔপনিবেশিক জীবনবোধের প্রকাশ যথাযথ ছিলো।

৩। ঐতিহাসিক বাস্তবতার স্বরূপ

ক) ঔপনিবেশিক মানসিকতা ও জীবনবোধ

খ) নীল চাষ-নীলকরদের অত্যাচার-নীল বিদ্রোহ

গ) পাবনার নীল ও কৃষক আন্দোলন

ঘ) প্রিন্স অব ওয়েলস্ এর বাংলা সফর

ঙ) নীলকর কেনী ও তার ক্রিয়াকলাপ

চ) নীলকর ও বিচারকদের অন্যায় সম্পর্ক--বিচার ব্যবস্থার অচলবস্থা

ছ) জমিদারি কোন্দল-জমিদারদের নৈতিক চরিত্রের অবনমন

জ) লাঠিয়াল-ডাকাতি

ঝ) ইত্যাদি

৪। সেই অর্থে কোনো গল্প রস নেই, তবু উপভোগ্য--সম্ভাব্য কারণ নির্দেশ

ক)) জীবন বাস্তবতা-সমাজ বাস্তবতা প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ স্পর্শ আছে।

খ) সামান্য সামান্য সব বিষয়কে শৈল্পিক রসে ডুবিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে।

গ) কোনো কোনো বিষয়ের বর্ণনা অতিশয় উপভোগ্য। যেমন--নৌকাযোগে রাজপুত্রের দেশভ্রমণ ও জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া, নদীর জলে নীল গাছ ভেসে যাওয়া।

ঘ) ঔপনিবেশিকাতর পীড়নে পীড়িত মননের অসামান্য আশ্রয় স্থল।

ঙ) স্রষ্টার নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান-দার্শনিক মনন।

চ) চরিত্রগুলি নিছক টাইপ ক্যারেকটার নয়, মানবিক গুণে ঋদ্ধ।

ছ) ভাষা আকর্ষণীয়, স্থানে স্থানে অনন্য সুন্দর।

জ) উপভোগ্য, তবে তারপরেও কথা থেকে যায়। এই উপভোগ্যতা সাধারণ পাঠকের দিক থেকে কতট বাস্তব। একটা বিশেষ শ্রেণির পাঠকের কাছে এটা উপভোগ্য হতে পারে, কিন্তু সকলের পক্ষে সমানভাবে এর রস আস্বাদ করতে না পারাই স্বাভাবিক। আর এই স্বাভাবিকতারই অনুবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে সাধারণের মধ্যে। গ্রন্থটি সাধারণের কাছে একেবারেই জনপ্রিয় হয়নি। শুধু সাধারণের ক্ষেত্রে কেন, বাংলা সাহিত্যের অনেক ঘনিষ্ঠ পাঠকের সঙ্গে উদাসীন পথিকের মনের কথা-র চেনাজানা মোটেই ঘনিষ্ঠ নয। মশাররফের বিষাদসিন্ধু জনপ্রিয়তার যে স্তর স্পর্শ করেছিল উদাসীন পথিকের মনের কথা-য় তার সামান্যও রক্ষিত হয়নি। এই অনাত্মীয়তার কিছুটা দায় পাঠকের উপর বর্তায় ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশটা থেকে যায় স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির পক্ষে।

৫। বাংলা গদ্যভাষার সংগঠন--মীর মশাররফ হোসেন ও উদাসীন পথিকের মনের কথা

ক) বাংলা ভাষার বয়স কমবেশি হাজার বছর। বাংলা গদ্য ভাষার বয়স সেই তুলনায় অনেক কম। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ বাংলা গদ্যভাষাশ্রিত প্রথম গ্রন্থ। বাংলা গদ্য ভাষায় নিয়মিত লেখালিখি

শুরু হয় তারও অনেক পরে উনিশ শতকের সূচনায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০) ও শ্রীরামপুর মিশনের সূত্রে।

খ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের তত্ত্বাবধানে যে গদ্যভাষার চর্চা হয়েছিল তার প্রধান কারিগর ছিলেন সংস্কৃত শিক্ষিত পণ্ডিত সমাজ। এই পণ্ডিত সমাজ সহজাত কারণে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের সাজে সজ্জিত করতে চেয়েছিলেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সেদিনের হিন্দু জাতীয়তাবাদ। তখন বাংলা ভাষায় প্রচুর পরিমাণে আরবি -ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হত। গদ্যভাষার সংগঠক পণ্ডিত শ্রেণি পছন্দ করেননি বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের এই আধিক্যকে। তাঁরা যথাসম্ভব আরবি ফারসি শব্দ সমূহকে বর্জন করে সেই স্থানে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন। এতে বাংলা গদ্যভাষা সংস্কৃতের ভারে ভাবাক্রান্ত হয়।

গ) অতিরিক্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন গদ্যভাষা ভারাক্রান্ত হয় অন্যদিকে তেমনি এর ফলে একটা সামাজিক সংকটও তৈরি হয়। মুসলমান সমাজ বিষয়টিকে মোটেই ভালোভাবে মেনে নিতে পারে না। এমনিতে বাংলা ভাষার প্রতি মুসলমান সমাজের আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। তারা প্রথমাবধি বাংলা ভাষাকে একান্ত আপন করে গ্রহণ করেছিল; আরবি বা ফারসির প্রতি অতিরিক্ত কোনো আনুগত্য দেখায়নি। তাই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হিন্দু সমাজ বাংলা ভাষার উপর এই যে অতিরিক্ত খবরদারি করলো এটা তারা মেনে নিতে পারলো না। তারাও প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান নিল। জন্ম হল মুসলমানী বাংলা। পণ্ডিতি বাংলার বিপরীতে মুসলমানী বাংলা। পণ্ডিত সমাজ যেমন জোর করে বাংলা ভাষা থেকে আরবি-ফারসি শব্দকে বর্জন করেছিলো মুসলমান সমাজ তেমনি জোর করে বাংলা ভাষার শরীরে অতিরিক্ত আরবি -ফারসি শব্দকে স্থান করে দিল।

ঘ) পণ্ডিতি বাংলা ও মুসলমানী বাংলার দ্বন্দ্বে সাহিত্য-সংস্কৃতির আকাশ তখন রীতিমতো মেঘাচ্ছন্ন। এমনি সংকটের দিনে বাংলা ভাষার চর্চায় ব্রতী হন মীর মশাররফ হোসেন। তিনি প্রথমেই ঘনীভূত সংকটের মূলে আঘাত করেন। পণ্ডিতি বাংলা ততদিনে বঙ্কিমমচন্দ্রের হাত ধরে ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মশাররফ দ্বিধাহীনভাবে বঙ্কিমী গদ্যকে মান্যতা দিলেন এবং এর অনুশীলনে ব্রতী হলেন। এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য ছিল আকাশস্পর্শী। বিষাদসিন্ধু-তে বাংলা গদ্যভাষার যে দৃষ্টান্ত তিনি উপস্থাপন করেছেন তার তুল্য দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে।

ঙ) বিষাদসিন্ধুতে মশাররফ গদ্যভাষার যে ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলেন তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে উদাসীন পথিকের মনের কথা-কে। গদ্যভাষা এখানে স্থানে স্থানে অসামান্য ছান্দিক স্পন্দনে ঋদ্ধ, কাব্যময়। আবার কোথাও কোথাও এর বস্তুনিষ্ঠতাও চোখে পড়ার মতো।

চ) ছান্দিক গদ্যের ব্যবহার রয়েছে মুখ্যত বর্ণনা অংশে। ...তরঙ্গের ভাষা যেমন...। লক্ষণীয় বাংলা গদ্যের শরীরে এই যে ছান্দিক স্পন্দন তৈরি করা হয়েছে তার জন্য এমন কোনো কারুকার্য করা হয়নি যাতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সেই অর্থে অলংকার বা ধ্বনিময় শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। প্রচলিত সব শব্দকেই নিপুণ হাতে প্রয়োগ করা হয়েছে; আর তাতেই এসেছে সৌন্দর্য। এ যেন সুগৃহিণীর সামান্য মসলা সহয়োগে অতি সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করা।

ছ) বঙ্কিম বাংলা গদ্যেকে বিশেষ নির্মিতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার গদ্য অনেকক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার বেড়া ডিঙিয়েছিল। তৎসম ধ্বনিময় শব্দ ব্যবহার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজিমাত করতে চেয়েছিলেন তিনি। মশাররফের গদ্যে এই সীমাবদ্ধতা নেই। আলাদা করে আভিধানিক শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে কোথাও কোথাও। কিন্তু

তাতে সৌন্দর্যের কোনো ঘাটতি হয়নি; বরং এতে মাধুর্য়ের সঙ্গে ওজঃ গুণের সমন্বয় হওয়ায় সৌন্দর্যের ঢল নেমেছে।

জ) মশাররফ যে স্থানে ছান্দিক স্পন্দন থেকে সরিয়ে এনে উদাসীন পথিকের মনের কথা-র গদ্যভাষাকে নিছক বাস্তবধর্মী, ব্যবহারিক রীতির করে তুলেছেন সেখানেও তা থেকে সহজাত সৌন্দর্যের উদ্ভাসন হয়েছে।...ভাষা এখানে আক্ষরিক অর্থেই গদ্যাত্মক। কিন্তু গদ্যভাষার কোনো ভার এতে নেই। এ ভাষার অন্তরঙ্গ পাঠ নিতে গিয়ে বেশ একটু অন্যরকম অনুভূতি হয়। আলাদা করে কোনো আয়োজন করা হয়নি, তবুও শৈল্পিক স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে। আর যাই হোক সংবাদের কেজো গদ্যের সঙ্গে এ ভাষাকে এক আসনে বসানো চলে না।

ঝ) গদ্যভাষার দুটি প্রধান রূপ বর্তমান--বর্ণনার ভাষা ও সংলাপ। এতক্ষণ আমরা উদাসীন পথিকের মনের কথা-র ভাষারীতি সম্পর্কে যা কিছু বললাম তার সবই বর্ণনার ভাষা। এখন আমরা যদি সংলাপের ভাষার অন্তরঙ্গ পাঠ নিই তাহলে দেখা যাবে এখানে সংলাপের ভাষাতেও রয়েছে বিশেষত্বের দিক। সংলাপের ভাষার সাধারণ রীতি অনুসারে এখানে সংলাপকে চরিত্রানুগ করা হয়েছে, আর এতেই পরিস্ফুট হয়েছে গদ্যশিল্পীর মুন্সিয়ানা। উদাসীন পথিকের মনের কথা-র সমস্ত পাত্র-পাত্রী দৃশ্যমান বাস্তবের মানুষ। এই অবস্থায় গদ্যকার ভাষার জালে যেমন তাদের সামাজিক বাস্তবতাকে ধরার চেষ্টা করেছেন তেমনি তাদের প্রতেক্যের ব্যক্তি-চরিত্রকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। আর এ কাজে তাঁর সাফল্য অসামান্য । নীলকর কেনী থেকে হতভাগিনী ময়না প্রত্যেকে নিজস্ব ভাষা-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়েছে।

ঞ) উদাসীন পথিকের মনের কথা-য় গদ্যশিল্পী মশাররফের সাফল্য নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে বিষাদসিন্ধু-র গদ্যভাষা যে উচ্চতায় পৌঁছেছে উদাসীন পথিকের মনের কথা-য় অবশ্যই তা হয়নি। এখানে ভাষারীতিতে অসামান্যতা আছে কিন্তু সেই অনন্যতা নেই। আপাত দৃষ্টিতে বক্তব্যটি অদ্ভূত বলে মনে হলেও কার্যত এখানে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। আসলে বিষাদসিন্ধু ও উদাসীন পথিকের মনের কথা গ্রন্থ দুটির মধ্যে মূলগত বিভিন্নতা রয়েছে। একটি ইতিহাস আশ্রিত রচনা, অন্য অর্থে ঐতিহাসিক রোমান্স, আর উদাসীন পথিকের মনের কথা নিছক বাস্তবধর্মী গদ্য আখ্যান। ঐতিহাসিক রোমান্সের ভাষারীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে কথাকার অনেক স্বাধীনতা ভোগ করেন। এখানে ভাষাকে ইচ্ছামত গড়ে নেওয়া যায়, অন্যদিকে উদাসীন পথিকের মনের কথা-র মতো রচনায় বাস্তবতার দাবি বা ওই জাতীয় আর কিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে হয়--এতে দুই এর মধ্যে বৈপরীত্য তৈরি হয়। এখানেও তাই হয়েছে।

ট) পরিশেষে তাই বলা য়ায়, বিষাদসিন্ধুতে গদ্যভাষা শিল্পী হিসাবে মশাররফ নিজেকে যে উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন উদাসীন পথিকের মনের কথা কথা-তে তার থেকে বেশি কিছু করে উঠতে না পারলেও বিশেষ পিছিয়ে থাকেননি। নিজস্ব ক্ষেত্রে উদাসীন পথিকের মনের কথা-র ভাষারীতি অসামান্য।